একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: উদ্‌যাপন, সাহিত্যসৃজন ও রাজনীতি

রাফাত আলম

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMRafat

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির অবস্থান সুচিহ্নিত। বাঙালি জাতিসত্তার রাজনৈতিক উন্মেষ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অনিবার্য ঘটনাক্রম হিসেবে এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও অনেকখানি সুসংজ্ঞায়িত। বায়ান্নর একুশের চেতনা বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ নির্ধারণে একটি অফুরন্ত শক্তির আধার হিসেবেও বিবেচিত হয়; যা প্রকাশিত হয় একুশের উদ্‌যাপনে, একুশের রাজনীতিতে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩– এই এক বছরের মধ্যে পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সংঘটিত হয় গুণগত পরিবর্তন। একুশকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্যকর্ম– কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক; সরকারি প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে প্রকাশিত হয় একাধিক সাহিত্য-সংকলন। এগুলো এক অর্থে উদ্‌যাপনেরই অংশ; কিন্তু এসব সাহিত্যসৃজনের রাজনৈতিক তাৎপর্যও অনস্বীকার্য। এছাড়া এক বছর পর ভাষাশহিদদের স্মরণ তথা প্রভাতফেরি, একুশের গান, শহিদ-সমাধি ও শহিদ মিনারে গমন ইত্যাদির ধরনের ভিত্তিতে ওই কালের জনসংস্কৃতির একটি পরিচয়-লাভ সম্ভব। বর্তমান গবেষণাকর্মের প্রাথমিক ও প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে ওই কালপর্বে প্রকাশিত একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর, খবরের শিরোনাম ও সম্পাদকীয় মন্তব্য। এর সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে যুক্ত হবে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টি, ভাষাসৈনিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণ ও আত্মকথন এবং সাহিত্য-সংকলনের পরিচয় ও গুরুত্ব।

১৯৫২ সাল হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে আর দশটি বছরের মতো নয়। বাংলাভাষী এই জনাঞ্চলের একটি রাজনীতিচিহ্নিত বছর ১৯৫২ এবং তার একুশে ফেব্রুয়ারি। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ এমন এক ক্ষণ, যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারে সে বাঙালি। বলা যায় বাঙালির আত্মপরিচয় আবিষ্কারের সূচনা-মুহূর্ত বায়ান্নর একুশ। বায়ান্নর একুশ কেবল আর সন-তারিখের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; পরিণত হয় একুশের চেতনায়। যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৭ থেকে শুরু হয়, অতঃপর ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ এবং অতিক্রম করে নানা পর্যায়, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তা একটি সামূহিক রূপ লাভ করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিণত হয় পূর্ববাংলার নিপীড়িত জনতার শোষণমুক্তির প্রতীকে। ফলে এর প্রভাব বিরাজমান থাকে বায়ান্নর পরেও। এক অর্থে চেতনাগতভাবে বায়ান্নর পরেই একুশের চেতনা বেশি ফলবান। একুশের এই প্রতিবাদী চেতনাকে সঙ্গে নিয়েই পাকিস্তান-পর্বের বাকি দুই দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও একুশের চেতনা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সমান্তরালে একুশের তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়েছে। সেই অর্থে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বা একুশের চেতনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে একটি অনিবার্য বিষয়। ফলে যে একুশের চেতনার উৎসারণ ঘটে ১৯৫২ সালে, তার প্রভাব, স্থায়িত্ব, গুরুত্ব নির্ভর করে অব্যবহিত

কালে জনমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে। যে-কোনো সফল রাজনৈতিক আন্দোলনকে সফল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে অব্যবহিত সময়ে তার উদ্‌যাপনের ধরন, তাকে আবর্ত করে সাহিত্যসৃজন এবং বৃহত্তর রাজনীতিতে তার আবেদনের মাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই বায়ান্নর ফেব্রুয়ারিকে ১৯৫৩ সালে কীভাবে বিবেচনা করা হয়, তার মধ্য দিয়ে একুশের চেতনার একটি বাস্তববাদী স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনে সচেতনভাবে কেবল ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিবেচনা করা হয়েছে; মূলত পূর্ববাংলার জনসমাজে ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত প্রভাব ও স্বরূপ অন্বেষণের জন্য। এই প্রবন্ধের তথ্যগত উপাদান-উৎস হিসেবে প্রধানত বদরুদ্দীন উমর রচিত *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (৩ খণ্ড) (প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০), *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল* (খণ্ড ১ ও খণ্ড ২) (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪), বশীর আল্‌হেলাল রচিত *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫), আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক রচিত *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১), বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *স্মৃতিচারণ'৮০* ও *স্মৃতিচারণ'৮১*, *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪* বইগুলো এবং তৎকালীন দৈনিক *আজাদ* ও সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। এই প্রবন্ধ রচনায় গবেষণাপদ্ধতি হিসেবে দালিলিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং নব্য ইতিহাসবাদী দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে।

উদ্‌যাপন

১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় 'শহিদ দিবস' হিসেবে। লক্ষণীয়, প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল শহিদ দিবস হিসেবেই পালিত হয়– 'শোক দিবস' নয়, 'মাতৃভাষা দিবস' নয়, এমনকি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবেও নয়। অবশ্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ১৯৫২ সালের ৫ই মার্চ 'শহিদ দিবস' ঘোষণা করেছিল এবং পূর্ববাংলা-ব্যাপী হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছিল; কিন্তু তা পূর্ণমাত্রায় পালিত হয়নি (উমর, ২০১২, পৃ. ৩৫২)। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের স্মরণে প্রতিবছর ওই দিনকে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছিল; ১৯৫৩ সালেও। 'শহিদ দিবস' শব্দবন্ধের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ববাংলার জনমানুষের সামূহিক অধিকার আদায়, বৈষম্যমুক্তি এবং জাতীয়তার প্রশ্ন জড়িত ছিল। পরবর্তী কয়েক দশকের চর্চা ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' শব্দবন্ধ যেভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি লাভ করেছে, তা ১৯৫২ বা ১৯৫৩ সালে উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না হলেও তার বহুমাত্রিক উপাদান বিদ্যমান ছিল এর সকল উদ্‌যাপনে। ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের খবর ও বিশ্লেষণ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*, *সৈনিক*, *নও-বেলাল* ও *পূর্ব-বাংলা* পত্রিকা। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম বলা যায় দৈনিক *আজাদ*-কে। *আজাদ* একুশে ফেব্রুয়ারি খবর প্রকাশ করেছিল; কিন্তু এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশিত হয়নি। তৎকালে *আজাদ* ছিল বহুল প্রচারিত দৈনিক।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং ৭ই মার্চে কর্মপরিষদের গোপন সভা থেকে অধিকাংশ নেতার গ্রেফতার হওয়ার পর ২৭শে এপ্রিল ১৯৫২ সম্মেলনের মাধ্যমে 'পূর্ব-পাকিস্তান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ' নতুনভাবে গঠিত হয়; এর আহ্বায়ক হন আতাউর রহমান খান (১৯০৫-১৯৯১) (উমর, ২০১২, পৃ. ৩৭৭)। কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' রূপে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানায়। কর্মপরিষদের পক্ষ

থেকে আহ্বায়ক আতাউর রহমান খানের বিবৃতিটি ১৯৫৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়:

> আসন্ন ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করিবার জন্য আমি পাকিস্তানের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী জনতার নিকট আবেদন জানাইতেছি। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা, শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও সকল রাজবন্দীর বিনাশর্তে মুক্তির দাবীকে বজ্রকঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করিবার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইতেছি। দেশের সকল দল ও সংগঠনের প্রতি আমার আবেদন – আপনারা সর্বত্র সংযুক্ত ফ্রন্ট মারফত অটুট ঐক্যের মধ্য দিয়া জনতার সুদৃঢ় সংহতি গড়িয়া তুলুন 'শহীদ দিবস'কে সার্থক ও জয়যুক্ত করিয়া তুলুন (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮১)।

ইত্তেফাক'-এর ওইদিনের (*ইত্তেফাক*, ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩; *আজাদ*, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩) সংখ্যা থেকে জানা যায়– আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানও (১৯২০-১৯৭৫) ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শহিদ দিবস পালনের আহ্বান জানান। বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, ''শান্তিপূর্ণভাবে শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের উপর দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে।'' জনাব রহমান অন্য এক বিবৃতিতে বলেন যে, ''শহিদ দিবস অবশ্যই উদ্‌যাপন করিতে হইবে– শান্তিপূর্ণভাবে ও শাসনতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে উহা পালন করিতে হইবে''– এপিপি (*আজাদ*, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)। ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক (১৯২৯-২০০৯) জানান (১৯৮০, পৃ. ১৫৪)– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি রোজা রাখার আহ্বান জানায়। ২০শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের অনেক ছাত্র এদিন রোজা রাখেন (*ইত্তেফাক*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)। ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত পাকিস্তান সাহিত্যসংসদ ১৯৫৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি এক জরুরি সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আহূত 'শহিদ দিবস'-এর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে (*আজাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩)।

১৯৫৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের খবর প্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলন-গবেষক বশীর আল্‌হেলাল *ইত্তেফাক* থেকে নিজের ভাষায় থেকে সেইদিনের ঘটনাক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন:

> একুশে ফেব্রুয়ারি সেবার শনিবার। উদ্‌যাপিত হচ্ছে শহীদ দিবস। রাজধানী ঢাকার প্রত্যেকটি দোকানপাট, বাস, রিক্সা, গাড়িঘোড়া, বাজার বন্ধ। স্টেট ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, লয়েড ব্যাঙ্ক-সহ সকল ব্যাঙ্ক হরতাল পালন করে। রেল, সিনেমা বন্ধ থাকে। হাজার-হাজার ছাত্র, কর্মী গম্ভীর পরিবেশে কালো ব্যাজ ধারণ করে রাস্তায় টহল দিচ্ছেন। শহীদদের ত্যাগের কথা স্মরণ করে গোটা শহর যেন চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অপূর্ব প্রেরণা। স্কুল-কলেজ বন্ধ। ভোরে ছাত্র-জনতা যখন দলে-দলে 'প্রভাত-ফেরি' করে শহীদদের মাজারে পুষ্প অর্পণ করতে যাচ্ছিলেন তখন শহরে করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকলের চোখে পানি, কিন্তু চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় প্রত্যয়। সকাল ৫টা থেকে বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্র ও মহল্লার মানুষ আজিমপুর গোরস্তানে গিয়ে শহীদদের সমাধিতে মালা দেন (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮২)।

আরও জানা যায়– সকাল ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে অনেক মিছিল এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। বেলা ১টার দিকে ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মিছিল বের হয়। 'সকলে কালো ব্যাজ ধারণ করে। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও মাগফেরাত কামনা করা হয়' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৩)। আরও লক্ষণীয় বিষয় ছিল– 'বাড়িতে বাড়িতে উড়ছিল কালো পতাকা। কোথাও কোথাও মেয়েরা বাড়ির ছাদ থেকে মিছিলের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। প্রতিটি বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো নানা বয়সী মেয়েরা' (মতিন ও রফিক ২০১৭, পৃ. ২২৩)। মিছিলটি ছিল বিশাল এবং সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ ওয়াদুদ (১৯২৫-১৯৮৩) মিছিল পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। মিছিল শেষে আরমানিটোলা ময়দানে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষাধিক মানুষের এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কর্মপরিষদের আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান। 'সভায় শহীদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোনাজাত করা হয়' (হক, ১৯৮০, পৃ. ১৫৬)। জনতার কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত যে স্লোগানগুলি সেদিন উচ্চারিত ও অনুরণিত হয়েছিল, সেগুলো হলো: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই! রাজবন্দীদের মুক্তি চাই! শহীদ স্মৃতি অমর হোক! জালেম লীগশাহী ধ্বংস হোক! গণপরিষদ ভেঙে দাও! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! লীগশাহীর দালাল মর্নিং নিউজ ধ্বংস হোক! ইত্যাদি' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৪)। এই স্লোগানগুলোর প্রতিফলন দেখা যায় সভায় যুগ্ম-আহ্বায়ক জমিরুদ্দিন আহমদ কর্তৃক উত্থাপিত কয়েকটি দাবিযুক্ত প্রস্তাবে; যেগুলো সভা থেকে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজবন্দিদের মুক্তি দাবি, মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অব্যাহত সংগ্রাম এবং বিশেষত অসুস্থ (মরণাপন্ন) মওলানা ভাসানীর বিনা শর্তে মুক্তি দাবি ছিল উক্ত প্রস্তাবের মূল উপজীব্য। সভায় যাঁরা বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, সৈয়দ আবদুর রহিম, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুস সামাদ, মাহমুদ আলী, সোলায়মান খান, হেদায়েতুল ইসলাম, এম. এ. ওয়াদুদ, গাজীউল হক, মতিয়ুর রহমান, আখতারুদ্দিন আহমদ, মিস হালিমা খাতুন, ইব্রাহিম তাহা, হেদায়েতুল ইসলাম সেলিম, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সদর আলী' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৫)। 'সন্ধ্যায় ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে [বর্তমান বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ] যে অনুষ্ঠান হয় সেখানেই প্রথম 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাওয়া হয়। আবদুল লতিফের সুরে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি ঐ অনুষ্ঠানে প্রথম গাওয়া হয়' (ইসলাম, ১৯৮১, পৃ. ২২-২৩)। অন্যদিকে, '২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, ওসমান আলী, অলি আহাদ-সহ সকল রাজবন্দী একদিনের জন্য অনশন করেন এবং খোরাকির টাকা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের কাছে প্রেরণ করতে অনুরোধ করেন' (*ইত্তেফাক*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩; আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৫)। একুশের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে কারাগারের অভ্যন্তরে রাজবন্দিদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আরও বিশদ জানা যায় ওইসময়ে রাজবন্দি ফজলুল করিমের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *বায়ান্ন'র কারাগার* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭) থেকে। তাঁর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় 'অজিত গুহের সিল্কের মোজা কেটে তৈরি হয়েছিল কালো ব্যাজ; সে ব্যাজ তাঁরা পরেছিলেন। তোয়াহার উলের কার্ডিগানকে বানানো হলো কালো পতাকা। বাইরে মিছিল যাওয়ার সময়ে তাঁরা স্লোগান দিতেন

ভেতর থেকে' [(করিম, ২০১৪, পৃ. ৫ (মুখবন্ধ, আনিসুজ্জামান)]। কারাগার-রাজপথ, ভেতর-বাহির সব একাকার হয়ে যায় একুশের চেতনামুখর স্লোগানে, উচ্চারণে, গানে ও প্রাণে।

১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন নির্বিঘ্ন ছিল না। গাজীউল হক (১৯৮০, পৃ. ১৫৪) জানান– ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির ছাত্রনেতাদের সেক্রেটারিয়েটে ডেকে পাঠানো হয়। পূর্ববাংলার তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইসহাক, পুলিশের আইজি দোহা এবং সামরিক বাহিনীর জিওসি মেজর জেনারেল আদমের সঙ্গে সংগ্রাম কমিটির আবদুস সালাম, মোহাম্মদ সুলতান, আখতারউদ্দিন, শামসুল হক, জিল্লুর রহমান, ইব্রাহিম তাহা ও গাজীউল হক দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে গ্রেফতারের আশঙ্কাও ছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। কিন্তু ছাত্রনেতাদের দৃঢ় অবস্থানের কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহূত কর্মসূচিতে বাধা প্রদান না করার আশ্বাস দেওয়া হয়। যদিও ২০ তারিখ দৈনিক *আজাদ*-এ সরকারের পক্ষ থেকে একটি 'ইশতাহার' প্রচার করা হয়েছিল; শিরোনাম: 'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনগণের সহযোগিতা আহ্বান'। ওই ইশতাহার বক্তব্যটি উল্লেখ করা হলো:

> ২১শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের ইশতাহার। ২১শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এক এশতেহারে শান্তি বিপন্ন হইতে পারে, এমন কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে আহ্বান জানান হইয়াছে। এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিকের "জানমালের নিরাপত্তা বিধান সরকারের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।" এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য যদি "সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন, তাহা খুবই পরিতাপের বিষয় হইবে। সুতরাং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সহযোগিতা করার জন্য সরকার জনসাধারণকে গভীর আগ্রহের সহিত আহ্বান জানাইতেছেন" (*আজাদ*, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)।

অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে পরোক্ষ চাপ ও নজরদারি ছিল। তথাপি 'বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজে শহিদ দিবস পালনের জন্য বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত স্থায়ী কোনো স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার ছিল না। 'মেডিকেল কলেজের রাজনৈতিক ছাত্ররা মিলে বিলুপ্ত স্মৃতিস্তম্ভের স্থানটিতে কালোকাপড় আর লালকাগজ দিয়ে তৈরি করেন এক প্রতীকী শহিদ মিনার। হুবহু প্রথম শহিদ মিনারের প্রতিকৃতি। তেমনি একটি প্রতীকী মিনার গড়ে ওঠে কার্জন হল প্রাঙ্গণে' (মতিন ও রফিক, ২০১৭, পৃ. ২২২)। 'ঢাকার কার্জন হলে ও মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা একটি করে 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণ করেন। কার্জন হলেরটি সাড়ে তিন ফুট উঁচু ছিল' (*ইত্তেফাক*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)। ঢাকা কলেজের ছাত্ররা এবং ইডেন কলেজের মেয়েরাও তাদের কলেজ প্রাঙ্গণে শহিদ মিনার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু উভয় কলেজ-প্রশাসন তাতে বাধা প্রদান করে। ফলে তারা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। এ-প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী এবং ওই আন্দোলনের আলোকচিত্র ধারণ করে যিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪-২০২১) তাঁর (১৯৮১, পৃ. ২২-২৩) স্মৃতিচারণ থেকে উল্লেখ করা যায়:

> ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা 'শহীদ দিবস' উদ্‌যাপন করব ঠিক করলাম। সে সময় ঢাকা কলেজ ছিল রেল স্টেশনের [ফুলবাড়িয়া] পেছনে সিদ্দিক বাজারে। তখন ইডেন কলেজের ল্যাবরেটরী ছিল না, ইডেনের ছাত্রীরা ঘোড়াগাড়ী করে ঢাকা কলেজে যেত প্র্যাকটিক্যাল করতে।

ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এবং ঢাকা কলেজের ছাত্ররা মিলে ঠিক করলো যে, তারা কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার গড়বে। সন্ধ্যা বেলা শহীদ দিবস উপলক্ষে তাঁরা একটা সভার আয়োজন করে। সে সময় ইডেনের অধ্যক্ষা ছিলেন মিসেস ফজিলাতুন নেসা জোহা আর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন খুব সম্ভবতঃ ইতিহাসের অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম। ঢাকা কলেজের ছাত্র ইকবাল আনসারী খান, আতিকুল ইসলাম, এনাম আহমেদ চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার তৈরি হতে থাকে। সেখানে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস ফজিলাতুন নেসা, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম এবং উর্দুর অধ্যাপক আহসান আহমদ আস্‌ক গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাধা দেন। ছাত্ররা শহীদ মিনার সম্পূর্ণ করতে পারেনি, তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সে ঘটনার পর বেশ কিছু সংখ্যক ছেলের দু'বছরের জন্য রাস্‌টিকেট হয়।

ছবি ১: প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ (শহিদ মিনার); ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

ছবি ২: ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নির্মিত শহিদ মিনার। *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪*-তে এর অবস্থান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হল (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল) উল্লেখ করা হলেও বর্তমান প্রবন্ধকারের অনুমান– এটি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সামনে নির্মিত ধ্বংসকৃত প্রথম স্মৃতিস্তম্ভের (শহিদ মিনার) অনুরূপ শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

ছবি ৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে [কার্জন হল] নির্মিত 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ'; ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

ছবি ৪: ইডেন কলেজের ছাত্রীদের উদ্যোগে শহিদ মিনার নির্মাণচেষ্টা ও অধ্যক্ষ কর্তৃক বাধা প্রদান

ছবি ৫: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-জনতার মিছিল, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

[ছবি ১ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত; ছবি ২, ৩, ৪ ও ৫-এর উৎস বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪*]

একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও মুখোমুখি হতে হয় প্রতিবন্ধকতার। সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* আগের কয়েকটি সংখ্যায় পাঠককে জানিয়ে আসছিলেন, তাঁরা বিশেষ সংখ্যা বের করবেন। কিন্তু সরকার সম্পাদককে ডেকে সংখ্যাটি সম্পর্কে কিছু 'অনুরোধ' করেন (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৯)। পরে বিশেষ সংখ্যা না বের হলেও ২৩শে ফেব্রুয়ারি নিয়মিত সংখ্যায় দুই পৃষ্ঠা যোগ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয় আবদুল গফুর (জ. ১৯২৯) সম্পাদিত *সৈনিক* পত্রিকার 'ভাষা আন্দোলন ও শহীদ সংখ্যা'– কলেবর ১৬ পৃষ্ঠা– ওইসময়ের বিবেচনায় বড় ও সাহসী আয়োজন। মাহমুদ আলী (১৯১৯-২০০৬) সম্পাদিত *নও-বেলাল* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, যেখানে 'কালো রেখা বেষ্টিত সম্পাদকীয়টি মুদ্রিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়, তার বৃহৎ টাইপের শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসের সংগ্রামী শপথ' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৯)। সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো:

> প্রতি বৎসরেই এই একুশে ফেব্রুয়ারী আসিবে, আবার শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে ঘৃণা আর ক্রোধের আগুন দেশবাসীর হৃদয়ে জ্বলিয়াছে, তাহার শেষ নাই– তাহা বারবার এমনিভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষার পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতি দিয়া শহীদগণ যে রক্তোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জাতির স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি লড়াইকে সুনিশ্চিতভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

এই কয়েকটি বাক্য থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি শক্তির জায়গাটি উপলব্ধি করা যায়। একুশ যে কেবল ভাষা-চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তৎকালে বরং জাতিগত মুক্তির একটি অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তার স্পষ্ট প্রকাশ আছে এখানে। সাপ্তাহিক *পূর্ব-বাংলা* পত্রিকাও ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'অমর শহীদ স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশ করে। কিন্তু *আজাদ* পত্রিকায় একুশে ফেব্রুয়ারি উপস্থাপিত হয়েছে সতর্কমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে। বহুল প্রচারিত দৈনিক *আজাদ*'র সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)। ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শেষ পাতায় এক কলামে তিন ইঞ্চি জায়গা বরাদ্দ করে 'শহীদ দিবস উদ্‌যাপন' শীর্ষক খবর প্রচার করা হয়, যেখানে কেবল আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতির অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়। ২১ তারিখ প্রথম পৃষ্ঠায় একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক কোনো সংবাদ বা রিপোর্ট নেই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলামে ছাপা হয় সম্পাদকীয়, শিরোনাম ছিল 'একুশে ফেব্রুয়ারী':

> একুশে ফেব্রুয়ারী
>
> গতবার ঠিক এই দিনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কিত দাবি লইয়া সারা পূর্ব্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ঢাকায় এই বিক্ষোভ অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে। পুলিশের গুলীতে কয়েক জনের মৃত্যু হয়। আজ এক বৎসর পরে সেই মর্ম্মন্তুদ ঘটনার স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন হইয়াছে। ছাত্রদের তরফ হইতে হরতাল পালন, শোভাযাত্রা পরিচালন এবং সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।
>
> এই শ্রেণীর সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার অধিকার সকল গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের সাধারণ অধিকার। এই অধিকার যেখানে বাধাগ্রস্ত, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে নাই। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব-পাক সরকার জন-সাধারণের এই গণতান্ত্রিক অধিকার মানিয়া লইয়াছেন। তবে তাঁদের তরফ হইতে এক এশতেহারে এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি যেমন সরকারের কর্ত্তব্য, তেমনি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও তাঁদের অন্যতম

> অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। গণতন্ত্রমনা কোনো বুদ্ধিমান নাগরিক এ-কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই এই 'দিবসে'র অনুষ্ঠাতাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিবৃতিসমূহেও আমরা অনুরূপ সতর্ক-বাণী উচ্চারিত হইতে দেখিতেছি। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। কাজেই আমরা আশা করিতে পারি, আজিকার 'দিবসে'র অনুষ্ঠানাদি শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে উদ্‌যাপিত হইবে (*আজাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)।

এবং ওইদিনের *আজাদ*'র শেষ পৃষ্ঠায় এক কলামে 'অদ্য শহীদ দিবস পালন' শীর্ষক একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের কর্মসূচির বর্ণনা দেওয়া হয়। যদিও সফল ও শান্তিপূর্ণভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের পরদিন *আজাদ* প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম-ব্যাপী 'ভাষা আন্দোলনে শহীদগণের প্রতি ঢাকার নাগরিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি' শীর্ষক শিরোনাম ও নিচে দুই কলাম-ব্যাপী স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক 'শনিবার স্বতঃস্ফূর্ত্ত হরতাল শোভাযাত্রা ও সভার অনুষ্ঠান' 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ও বন্দীমুক্তির দাবী জ্ঞাপন' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি *আজাদ*-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে' গণপরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং ২৬ তারিখ প্রথম শহিদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করেছিলেন। যদিও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ *আজাদ*-এ প্রকাশিত হয়:

> বেলা দুইটার দিকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা লালবাগের দিক হইতে '*আজাদ*' অফিসের সম্মুখ দিয়া মোছলেম হলের দিকে যাইবার সময় শোভাযাত্রাটির কিছুসংখ্যক লোক 'আজাদ' অফিসের কর্মচারীদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শাসাইতে থাকে। '*আজাদ*' কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীগণ কর্তৃক ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তর নিক্ষেপকারীগণ বিক্ষোভ করিতে থাকে। অতঃপর শোভাযাত্রার কতিপয় ছাত্রকর্মীর হস্তক্ষেপের ফলে ও তাহদের পরামর্শে বিক্ষোভকারিগণ ক্ষান্ত হইয়া সম্মুখে অগ্রসরে হয়।

এ-থেকে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে *আজাদ* পত্রিকার অবস্থান ও ছাত্র-জনতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে চেতনাচিহ্নিত। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী যে ছিল জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্‌যাপন, আলোচিত ঘটনাক্রম তার নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য দেয়। নেতৃবৃন্দও তাদের দ্বিধার বৃত্ত ভেঙে জনমানুষের স্পন্দনকে বুঝতে ও গুরুত্ব দিতে সমর্থ হয়। এখানে চেতনাগতভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো– রোজা রাখা, মোনাজাত করা, ভাষাশহিদদের কবর জিয়ারত করা, শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, ছাদ থেকে মেয়েদের পুষ্পবৃষ্টি, কালো ব্যাজ পরিধান, ছাদে কালো শাড়ি ওড়ানো, সভা, স্লোগান– এই সবই ঘটেছে একুশ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে। এই জনাঞ্চলের অধিকারসচেতন লোকায়ত ঐতিহ্যও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রোজা রাখা আর শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই সেখানে। রোজার মতো ধর্মীয় বিষয়ও যুক্ত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মতো একটি সম্পূর্ণত ইহলৌকিক কর্মসূচির আওতায়। ফলে একুশ এখানে আরও বেশি লৌকিক ও প্রায়োগিক হতে পেরেছে জনমানুষের বিশেষত মুসলমানি ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গগুলোকে সহজে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে। একুশের চেতনা ১৯৫৩ সালেও ছিল সম্পূর্ণত সেক্যুলার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; কিন্তু তা থেকে ধর্মীয় চেতনা বাদ যায়নি। বরং দেখা যায় ধর্মীয় উপাদানগুলোও অর্জন করে সেক্যুলার চারিত্র্য। একই শ্রেণির সচেতন শিক্ষিত জনতা যেমন শহিদের জন্য রোজা রাখে, মোনাজাত করে, কবর জিয়ারত

করে; এই শ্রেণিই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে সংগ্রাম করে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে এবং 'আমার সোনার বাংলা' বা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানে কণ্ঠ মেলাতে কুণ্ঠিত হয় না।

মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালিদের আত্মপরিচয় নির্মাণে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। বাঙালি মুসলমান না বাঙালি– এই দ্বিধা বাঙালিত্বের মীমাংসায় এক জটিল সমীকরণ। একুশ নির্ধারণ করে দেয় নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র ও অধিকারসচেতন নাগরিকের পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থানের একটি সুচিহ্নিত সমীকরণ। একই সঙ্গে একুশ উপলক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক কর্মতৎপরতা এবং ঢাকার নাগরিক বা নাগরিক-উন্মুখ তরুণদের মধ্যে এমন কিছু প্রগতিশীল চিত্র, কর্মক্রিয়া ও নৈতিক অবস্থান লক্ষ যায়, যা বিস্ময়কর ও একইসঙ্গে আশা জাগানিয়া। সেখানে ঘটে ধর্মবোধ ও রাজনৈতিক বোধের অপূর্ব মিথস্ক্রিয়া। যে মুসলমান বঙ্গসন্তানরা একসময় প্যান-ইসলামিক ধারণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, রাজনৈতিক গতিধারার পরিবর্তনের ফলে তারাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহিদদের স্মরণে রোজা রাখে; সেটা রমজান মাসে না, ফাল্গুন মাসে। রোজা রাখার তাৎপর্য এইখানে যে– বাংলা মুসলমানের ভাষা কি না তা নিয়েই যখন একসময় দ্বিধা ছিল, সেখানে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণবিসর্জনকারীদের প্রতি শোক ও প্রতিবাদ হিসেবে মুসলমান তরুণ-তরুণীরা রোজা রাখে। এই রোজা রাখা যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। বাংলার জনমানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামে বায়ান্ন-পরিস্রুত এই বোধকে সমালোচক অভিহিত করেছেন নতুন রেনেসাঁস হিসেবে:

> ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সিনথেসিসে পৌঁছায় এই সংগ্রাম। সৃষ্টি হয় নতুন চেতনা, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ। এর মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক এক রেনেসাঁসের জন্ম হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয় নবজাগরণ (হক, ২০২২, পৃ. ৪৬)।

বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক; এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্র ও জনতার স্বার্থ এবং দুইয়ের টানাপোড়েন। একুশে ফেব্রুয়ারিজাত যে চেতনা এই জনাঞ্চলের মানুষকে সামনের দিকে ধাবিত করে, তা হলো সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ চেতনা। এক অর্থে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির প্রথম সেক্যুলার রাজনৈতিক ঘটনা, যা সম্ভব হয়েছিল পূর্ববাংলায়। জলবায়ু ও জীবনযাপন পদ্ধতির আভ্যন্তর উদারতার মধ্যে বিকশিত এই জনাঞ্চলে এমন লোকায়ত সব ধর্মচিহ্ন ও ইহলৌকিক উদ্‌যাপনচিহ্নের মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হয়েছিল। ধর্মীয় বোধকে সঙ্গে করে নিয়েও এই জনাঞ্চলের চিরায়ত লোকায়ত ঐতিহ্যে লালিত মানুষ অধিকার আদায়ে, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে, গণতন্ত্রায়ণে বেশি ক্রিয়াশীল।

সাহিত্যসৃজন

বাংলাদেশের সাহিত্য পর্যালোচনাসূত্রে এ-কথা বলা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পর্ক সমান্তরাল। ইতিহাস ও রাজনীতির পাঠের মতো সাহিত্যও তৈরি করে একটি জনাঞ্চলের পাঠ ও পাঠান্তর। অপরাপর জাতি ও ভাষার সাহিত্যের মতো বাংলাদেশের সাহিত্যও দেশ-কাল ও সমাজ-সাপেক্ষ। সৃজনশীল সাহিত্যকরা তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায় হয়েছেন রাজনৈতিক ঘটনা ও তৎপরতার অনুগামী। এ-কথা চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলন, চল্লিশের দশকের শেষ থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলা যায়। তবে একুশে ফেব্রুয়ারি সেই বিষয়কে আরও সুচিহ্নিত করে দেয়।

একুশের প্রথম কবিতা হিসেবে স্বীকৃত মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (১৯২৭-২০০৭) 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'; রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায়, চট্টগ্রামে। 'সেই রাত্রেই কোহিনূর ইলেক্ট্রিক প্রেসে কবিতাটি ছাপিয়ে ফেলা হয়। শেষরাত্রে পুলিশের হামলা ঘটলে কম্পোজ করা ম্যাটার তড়িঘড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে ১৫ হাজার কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছিল। পরের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লালদীঘির ময়দানে আয়োজিত বিশাল প্রতিবাদসভায় ঐ কাব্যপুস্তিকা বিলি করা হয় এবং সভায় কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান আজকের প্রবীণ ন্যাপ নেতা চৌধুরী হারুনর রশীদ' (মামুদ, ১৯৮৫, পৃ. ২৬)। প্রকাশের কয়েকদিন পর সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) লিখেন 'স্মৃতির মিনার' কবিতা; মূলত প্রথম শহিদ মিনার ভাঙার প্রতিবাদে। হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) 'অমর একুশে' কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের মার্চ/এপ্রিলের দিকে। এরপর একুশ নিয়ে কবিতা লিখেছেন বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রায় সব কবি। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম সাহিত্যসংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*'তে 'একুশের কবিতা' শীর্ষক অভিন্ন শিরোনামে এগারোজন কবির এগারোটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় একুশের উপস্থিতি ও উপস্থাপন অপরাপর সাহিত্যসৃজনের চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ, সজীব ও শক্তিশালী।

একুশের সংকলন

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনকে ঘিরে সাহিত্য-সংকলন প্রকাশ ওই কালে একুশের আবেদনের সামূহিক মাত্রাকে চিহ্নিত করে। একুশের প্রথম সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী* হলেও ঢাকা থেকে একুশের প্রথম স্মরণিকা ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীর *শহীদদের স্মরণে*; প্রকাশকাল: ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। তখনকার প্রশাসনের বিরুদ্ধ অবস্থানের কারণেই হয়তো উক্ত স্মরণিকায় কোনো রচয়িতা, সংকলক, সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম প্রকাশিত হয়নি। চার পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ভূমিকা অংশ শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা দিয়ে 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই / নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই' এবং শেষে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'বন্দী থাকা হীন অপমান', 'হাঁকবে যে বীর তরুণ/ শীরদাঁড়া যার শক্ত তাজা রক্ত যাহার অরুণ...', 'আমাদের কথা', 'ভুলি নাই রক্ত রাঙা একুশের কথা', 'একুশের গান'– এভাবে বিন্যস্ত হয়েছে স্মরণিকাটি। 'আমাদের কথা' অংশের শেষ অনুচ্ছেদটি উল্লেখযোগ্য:

> আজ ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই রক্তরঞ্জিত সূর্য্যের লোহিত-কিরণ-চ্ছটা পূর্বাচলকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। আবার আসিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, আজ শহীদদের আদর্শ আমরা স্মরণ করি, প্রণতি জানাই তাহাদের দুর্গম-দুঃসাহসিক অভিযানকে। কারাপ্রাচীরের দুঃসহ বন্ধনে যাহাদিগের অমূল্য জীবনকে তিলে তিলে দগ্ধ করা হইয়াছে, তাহাদেরও আজ স্মরণ করি। লক্ষ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আজ জাগাই আমাদের শাশ্বত আদর্শের রুদ্রভেরী। কণ্ঠে কণ্ঠে আজ আওয়াজ তুলি– 'রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই' (মোমেনীন, ১৯৯১, পৃ. ৯)।

বহুল প্রচারের জন্য স্মরণিকায় মুদ্রিত ছিল– 'নিজে পড়িয়া অপরকে পড়িতে দিন'। একুশের গানের রচয়িতা যে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২) এটি এই স্মরণিকায় জানা না গেলেও অব্যবহিত পরবর্তী সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*'তে অভিন্ন গানটি রচয়িতার নামসহ প্রকাশিত হয়।

'একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এমনি এক যুগান্তকারী দিন। শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা'– এই কথাগুলো দিয়ে সূচিত হয়েছে হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলনগ্রন্থ *একুশে ফেব্রুয়ারী*'র ভূমিকাংশ। ১৯৫২ সালের এই রক্তিম অথচ প্রাণদায়িনী একুশে ফেব্রুয়ারির এক বছর পর ১৯৫৩ সালে একুশের শোক, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও সামূহিক সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হয় একদল দুঃসাহসী তরুণের রক্তের অক্ষরে লেখা সাহিত্য-সংকলনগ্রন্থ *একুশে ফেব্রুয়ারী*। সম্পাদক হিসেবে ঐতিহাসিক দায়িত্বটি পালন করেন পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি হাসান হাফিজুর রহমান। 'ভাষা আন্দোলনের শিল্পিত আবেগপুঞ্জকে সংরক্ষিত করার এই কর্মোদ্যোগ, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনচেতনার এক গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত। জাতীয় ইতিহাসের এক মহত্তম অধ্যায়ের রক্তাক্ত অনুভূতিপুঞ্জকে গ্রন্থবদ্ধ করে বাঙালি জাতির জীবন ও শিল্পচেতনায় পটভূমিতে তিনি মর্যাদার স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন' (খান, ১৯৯৩, পৃ. ২৪)। এই সময়ে খুব সহজ ছিল না এমন একটি সাহিত্য-সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা। একদিকে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির রক্তচক্ষু, অপরদিকে স্বাধিকার চেতনার অগ্নিমন্ত্রে জেগে ওঠার শক্তি। শেষ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার মতো বেরিয়ে এলো ওই সময়ের তরুণপ্রাণ কবি-সাহিত্যিকদের রক্তস্নাত শব্দাবলি– *একুশে ফেব্রুয়ারী*। *একুশে ফেব্রুয়ারী* প্রকাশ করতে প্রথমত ও প্রধানত সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। আন্তরিক প্রণোদনা থেকেই তাঁর এই কর্মোদ্যোগ। সংকলন প্রকাশের ব্যয় নির্বাহ করতে তিনি পৈতৃক জমি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এই তথ্যটি দিয়েছেন সংকলনের প্রকাশক ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মোহাম্মদ সুলতান (১৯৮৩, পৃ. ৬৩)।

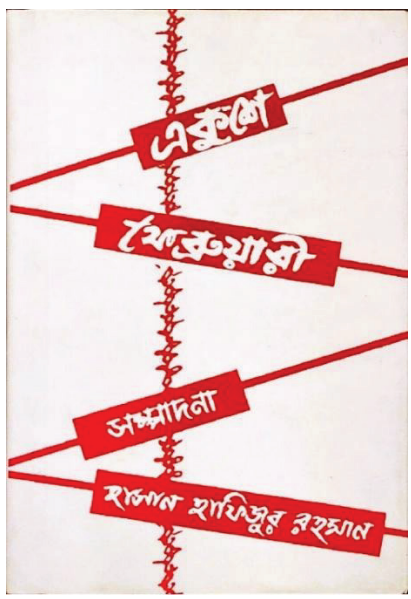

[*একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনগ্রন্থের প্রচ্ছদ; উৎস: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার]

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে। এই তথ্যটি পাওয়া যায় *একুশে ফেব্রুয়ারী*'র ১৯৮৯ সংস্করণের প্রকাশক সুস্মিতা সুলতানার 'প্রকাশিকার নিবেদন' থেকে। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তৎকালীন সরকার একে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয় লাভ করে ও সরকার গঠন করে। তাদের শাসনামলে, ১৯৫৬ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। *একুশে ফেব্রুয়ারী* প্রকাশ করে পুঁথি পত্র প্রকাশনী। প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতান (১৯২৬-১৯৮৩)। প্রচ্ছদ এঁকেছেন আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১) এবং ভেতরে বেশ কয়েকটি রেখাঙ্কন ও ছাপচিত্র এঁকেছেন মুর্তজা বশীর (১৯৩২-২০২০) ও অন্যান্য। সংকলনটির প্রথম সংস্করণ ক্রাউন সাইজে তৈরি করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৮৩। দাম দু টাকা আট আনা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলনগ্রন্থে হাসান হাফিজুর রহমানের ভূমিকাসহ মোট তেইশটি রচনা স্থান পায়, যার মধ্যে একটি প্রবন্ধ, এগারোটি কবিতা, পাঁচটি গল্প, দুটি নকশা, দুটি গান, 'একুশের ঘটনাপঞ্জী' শীর্ষক একুশের ইতিহাস। আনিসুজ্জামানের (১৯৩৭-২০২০) হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে উৎসর্গপত্র (ঘোষ, ২০১৪, পৃ. ১৩৪), যখন তিনি ষোল বছরের কিশোর। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল:

যে অমর দেশবাসীর মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছে
একুশের শহীদেরা,
যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে
একুশের প্রতিজ্ঞা,
তাঁদের উদ্দেশ্যে

অর্থাৎ প্রবল স্বজাত্যবোধ, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করে, একুশের শহিদদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এই সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই বোধের প্রকাশ সংকলনভুক্ত প্রতিটি রচনার মধ্যে স্পষ্ট। সম্পাদকীয় বা ভূমিকাংশে হাসান হাফিজুর রহমান সংহত বাণীবন্ধনে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর উচ্চারণে প্রকাশিত হয়– একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন কেবল ওই সময়ের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি; বরং তা হয়েছিল ভবিষ্যৎমুখী:

> একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রথম ব্যাপক পশ্চাদপসরণের সূচনা করেছে। সূচনা করেছে জনতার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়াভিযান এবং সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক নবজাগরণের। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন (রহমান, ১৯৮৯, পৃ. ৩)।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারিকে। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সেই আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল, যার প্রধান কাণ্ডারি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনি কেবল সম্পাদনাই করেননি, বাঙালির আত্মপরিচয়গত সংকট-মোচনে ও নতুন পরিচয় নির্মাণের ক্রান্তিকালে পালন করেছেন ঐতিহাসিক দায়িত্ব। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসংকোচে ও সামষ্টিকভাবে প্রতিবাদ করতে পেরেছিল তখনকার তরুণরা। আশঙ্কা ও নতুন আশাবাদের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারির প্রজ্বলিত চেতনাকে সফলভাবে শিল্পরূপ দিতে পেরেছিলেন তাঁরা।

এ দুই স্মরণিকা-সংকলন প্রকাশেরও আগে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *ওরা প্রাণ দিল* শীর্ষক একটি একুশের স্মরণিকা সম্পর্কে জানা যায় ফজলুল করিমের *বায়ান্ন'র কারাগার* বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে। প্রিন্টার্স লাইন থেকে জানা যায়, সেই সংকলনের প্রকাশক শিবব্রত বর্মণ, বেণু প্রকাশনী, ২০ বি, বালীগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা-১৯; ছেপেছেন: প্রিন্টার্স কংগ্রেস লিঃ, ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১; প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৫৯। ২০ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় কবিতা লিখেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, সৈয়দ আবুল হুদা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মূর্তজা বশীর, নিত্য বসু, তানিয়া বেগম এবং 'সহকর্মী' ছদ্মনামে সম্পাদক নিজেই। তবে পরবর্তীকালে ফজলুল করিম (২০১৪, পৃ. ৭১) জানিয়েছেন এই সহকর্মী মূলত মানিকগঞ্জের বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী প্রমথ নন্দী। স্মরণিকার প্রথমেই ভাষাশহিদ সফিউর রহমানের ছবি মুদ্রিত হয়েছিল। এরপর কয়েকটি বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছিল: 'মাতৃভাষার জন্যে শহীদ হয়েছেন ছাব্বিশ জন। আহত হয়েছেন একশ পঁচিশ জন। বন্দি হয়েছেন ন'শ জন।' প্রকাশের কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গ সরকার এক বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই স্মরণিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (করিম, ২০১৪, পৃ. ৭২)। ফজলুল করিমের দাবি ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী *ওরা প্রাণ দিল* একুশের প্রথম স্মরণিকা।

[একুশের প্রথম স্মরণিকা *ওরা প্রাণ দিল*-র প্রচ্ছদ। ছবি: ফজলুল করিম রচিত *বায়ান্ন'র কারাগার* গ্রন্থ (২০১৪, পৃ. ৭৩)]

একুশের গান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা একুশের গান ১৯৫৩ সালের একাধিক স্মরণিকা-সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনগ্রন্থ থেকে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী রচিত একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। এই গান ও একুশে ফেব্রুয়ারি এখন অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। এই গান আলোড়িত করেছিল পুরো বাঙালি জাতিকে। এই গান মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী বোধকে করেছিল শানিত। একুশের সংকলনগ্রন্থে প্রকাশ পাবার আগেই গানটিতে সুরারোপ করেন আবদুল লতিফ (১৯২৭-২০০৫)। তাতে ছিল রণসংগীতের সুর। পরবর্তীকালে সংগীতপরিচালক আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩-১৯৭১) এতে খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা-সংগীতরীতির সুর প্রদান করে গানের ব্যঞ্জনাকে বাঙালির সত্তায় গেঁথে দেন। গানটির সম্পূর্ণ অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কাল বোশেখিরা
শিশু-হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রেখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুনরাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিলো হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো খ্যাপা বুনো ॥

সেই আঁধারে পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি॥
(আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর হস্তলিপি থেকে গৃহীত পাঠ; উদ্ধৃত, চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ১৪-১৫)

গানটি বেশ দীর্ঘ– ত্রিশ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট; তবে গীত হয় প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। এ-নিয়ে আবদুল গাফ্‌ফারের অভিযোগ আছে। তিনি জানান:

> আমার দুঃখ গানটির যে অংশ উদ্দীপনামূলক সেই অংশটি ক্রমশ বর্জিত হচ্ছে। যে অংশটি শোকমূলক-শোকগাথামূলক সেটুকু শুধু গাওয়া হচ্ছে। উদ্দীপনাময় অংশ গাইতে Establishment ভয় পায়। আমি পাকিস্তান আমল থেকে দেখছি যে উদ্দীপনামূলক অংশটুকু তারা গায় না। ... আমার গানটিও খণ্ডিতভাবে গাওয়া হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। পুরো গানটি গাইতে Establishment ভয় পায়। এই ভীতি থেকেই একুশকে আমরা স্মৃতি করে ফেলেছি (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ২৪-২৬)।

আবদুল গাফ্‌ফারের এই পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানসর্বস্ব একুশে ফেব্রুয়ারি তথা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতার মধ্যেও উপলব্ধি করা যায়।

একুশের গান হিসেবে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর গানটি বহুল জনপ্রিয়তা পেলেও প্রথম একুশের গানের রচয়িতা ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক। 'বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পর একুশের প্রথম গান রচনা করেছিলেন ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক। ... গানটির সুর দেওয়া হয়েছিল হিন্দি 'দূর হাঁটো দূর হাঁটো। ঐ দুনিয়াওয়ালে, হিন্দুস্তান হামারা হায়'-এর অনুকরণে' (এম আর মাহবুব, উদ্ধৃত, আলীম, ২০২০, পৃ. ৪৩২)। ১৯৫২ সালের পরের কয়েক বছর প্রভাতফেরিতে তাঁর রচিত এই গান গাওয়া হতো। গানটি হুবহু উদ্ধৃত হলো:

ভুলবনা ভুলবনা এই একুশে ফেব্রুয়ারী
ভুলবনা।
লাঠিগুলি, টিয়ার গ্যাস, মিলিটারী আর মিলিটারী
ভুলবনা ॥
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবীতে ধর্মঘট,
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ,
ভুলবনা ॥
স্মৃতি সৌধ ভাঙ্গিয়াছ জেগেছে পাষাণে প্রাণ,
মোরা কি ভুলিতে পারি খুন রাঙা জয় নিশান?
ভুলবনা॥ (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭)।

এতে সুরারোপ করেছিলেন তাঁর অনুজ নিজাম উল হক। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের উদ্দেশে গাজীউল হক আরও একটি গান রচনা করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমরের কাছে পাঠানো চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭)।

একুশের নাটক

একুশের প্রথম নাটক মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) রচিত *কবর*। এর রচনাকাল ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাস। মুনীর চৌধুরী তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির গণহত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এক প্রতিবাদ ও শোকসভা করেছিলেন ২৪শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে। ঐ সভায় বক্তব্য দিয়েছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী (১৯২২-১৯৭৮), ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২) এবং মুনীর চৌধুরী (উমর, ২০১২, পৃ. ৩২০)। ২৬শে ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। তাঁরা ১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগ পর্যন্ত ছাড়া পাননি (ইসলাম, ২০০৪, পৃ. ২৬৫)। কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় আরেক রাজবন্দি বামপন্থি রাজনৈতিক রণেশ দাশগুপ্তের (১৯১২-১৯৯৭) গোপন চিঠির অনুরোধে '১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় মুনীর চৌধুরী *কবর* নাটকটি রচনা করেন' (জয়নুদ্দীন, ১৯৯৮, পৃ. ১০৮)। মুনীর চৌধুরীর নাটক রচনায় মুনশিয়ানা ছিল। তারই সার্থক প্রকাশ ঘটে জেলে বন্দিদের কুশীলব করে, নারীচরিত্র বর্জিত, স্বল্প আলোতে জেলখানার মতো একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাত দশটার পর *কবর* নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। নাটকটির পরিচালনা করেন ফণী চক্রবর্তী। পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ, নাম-হীন নেতা, মুর্দা ফকির, গার্ড ও কয়েকটি মূর্তির সহযোগে মুনীর চৌধুরী যে একাঙ্কিকা রচনা করলেন এবং সকল গোপনীয়তা রক্ষা করে যে সফলভাবে মঞ্চস্থ করলেন, সে-কারণে *কবর* কেবল নাট্যসাহিত্য বা শিল্পের বিষয় হয়ে থাকে না, পরিণত হয় বাংলাদেশের ইতিহাসের অনিবার্য অনুষঙ্গে। 'রাজনৈতিক আন্দোলননির্ভর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে *কবরের* নাম। *কবর* মানে রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্দীপ্ত জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত, প্রত্যয়বোধে ঋদ্ধ একটি সফল শিল্পরূপ' (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৬, পৃ. ১০৫)। একবছর পূর্বের একুশের শোক ও ক্ষোভ শিল্পের আধারে ধরা পড়ে *কবর* নাটকে, যেখানে শ্রেণিচরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে শোষক ও শোষিতের অবস্থানটি সুচিহ্নিত করে দেন মুনীর চৌধুরী।

একুশের উদ্‌যাপন কখনোই সরল ছিল না। তেপ্পান্নর উদ্‌যাপন ভবিষ্যতের আন্দোলন ও রাজনৈতিক গতিধারার একটি পথরেখা নির্মাণ করে। তার অব্যবহিত পরেই দেখা যায় একে একে রাজবন্দিদের মুক্তি প্রদান, যুক্তফ্রন্ট গঠন, যুক্তফ্রন্টের ইশতাহারে একুশের স্মরণে একুশ দফা, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় তথা মুসলিম লীগের পরাজয়– এমন আরও অনেক রাজনৈতিক ঘটনাক্রম। এর তাৎপর্য সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম লিখেছেন:

> ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা দিবসে [শহীদ দিবসে] সমগ্র বাংলাদেশে যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে নূরুল আমিনের পরাজয় সূচিত হয়েছিল; আর ১৯৫৩ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত বারটার সময় সারা বাংলাদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা বাংলার যে শ্লোগান উঠেছিল, সে শ্লোগান সরকার এবং মুসলিম লীগকে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল (মামুদ, ১৯৮৫, পৃ. ৩০)।

১৯৫৩ আর ২০২৪– এই দুই প্রান্তের উদ্‌যাপন থেকে উপলব্ধি করা যায়– কত যোজন যোজন ব্যবধান। 'শহীদ দিবস' এসে ঠেকেছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনে। মর্মমূলে প্রবেশ না করে

অনুষ্ঠানসর্বস্বতা কেবল হাল আমলের বিষয় নয়; এর শুরু আরও আগে। ১৯৮১ সালে লিখিত এক প্রবন্ধে আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৯৮, পৃ. ৩৯) জানাচ্ছেন:

> মর্মগত দিকদিয়ে জনগণের সেই চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ১৯৫২ সনের 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ', ১৯৫৪ সনের 'যুক্তফ্রন্ট', ষাটের ও সত্তরের দশকের 'আওয়ামী লীগ' ও 'বাকশাল', এবং বর্তমানের 'বিএনপি' প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবর্গের চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে ভিন্ন। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুআরিতে রাত ১২টা ১ মিনিটের সময় আজিমপুর গোরস্তানে কিংবা শহীদ মিনারে কার আগে কে ফুল দেবে, তা নিয়ে যাঁরা ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি করেন, সংবাদপত্রের কিংবা টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে আসার জন্য ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন, তাঁরা সব কিছুই নগদ নগদ আদায় করে ছাড়েন।

এই প্রবণতা হাল আমলে বেড়েছে বৈ কমেনি। তবে একাত্তর-পূর্বকালে একুশ যেভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা শোষণের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিবাদী অনুষঙ্গ হতে পেরেছিল, একাত্তর-পরবর্তীকালে তার চেতনাগত স্বরূপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সাহিত্যসৃজন মূলত একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনেরই অংশ। স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে এসবের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে রচিত কোনো সাহিত্যকর্মের বিচার কেবল 'শিল্পের জন্য শিল্প' দৃষ্টিকোণ দিয়ে করা যায় না। একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম বার্ষিকীকে ঘিরে যে রাজনৈতিক তৎপরতা, সাংগঠনিক কর্মকৌশল এবং একইসঙ্গে শিল্পসৃষ্টি, সাহিত্যসৃজন কিংবা উপস্থাপন– এ-সবগুলো মিলে যে চিহ্নসমষ্টি তৈরি করে তাকে বলা যায়– উদ্‌যাপনের রাজনীতি। প্রথম বার্ষিকী থেকে বর্তমান পর্যন্ত এর উদ্‌যাপনের ধরন বিভিন্ন সময়ে নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি নানামাত্রিক কারণেই বিশেষ। প্রতিকূল পরিস্থিতি, পরোক্ষ চাপ ও বাধা সত্ত্বেও একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩-এর সর্বপ্লাবী উদ্‌যাপন কেবল উদ্‌যাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর কতকগুলো চিহ্ন বাংলাদেশ জনাঞ্চলের জনস্পন্দন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের শনাক্তি– সর্বোপরি রাজনৈতিক দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করে। এই সামূহিক কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণবিন্দু।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান (১৯৮৬)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*। ঢাকা: মুক্তধারা।

আল্‌হেলাল, বশীর (২০১৬)। *ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস*, তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০২০)। *ভাষা-আন্দোলন-কোষ*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৮১)। *স্মৃতিচারণ'৮১*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ইসলাম, রফিকুল (২০০৪)। 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা'। *বাঙলাদেশ*, দ্বিতীয় সংস্করণ। মনসুর মুসা [সম্পা.]। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১২)। *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (খণ্ড ৩)। ঢাকা: সুবর্ণ।

করিম, ফজলুল (২০১৪)। *বায়ান্ন'র কারাগার*, তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

খান, রফিকউল্লাহ (১৯৯৩)। *হাসান হাফিজুর রহমান: জীবন ও সাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খান, শামসুজ্জামান ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (১৯৮৪)। *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ (২০১৪)। *কথামালা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

চৌধুরী, আসাদ (২০১৫)। *আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী: একুশের গান ও আড্ডা*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা: প্রিয়মুখ প্রকাশন।

মতিন, আবদুল ও রফিক, আহমদ (২০১৭)। *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য*, পঞ্চম মুদ্রণ। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

মামুদ, হায়াৎ (১৯৮৫)। 'একুশে উদ্‌যাপনের ইতিহাস'। শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য [সম্পাদিত]। *একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৫*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মোমেনীন, আমিরুল [সংকলিত ও সম্পাদিত] (১৯৯১)। *একুশের সংকলন : গ্রন্থপঞ্জী [১৯৫৩-১৯৮৯]*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রহমান, হাসান হাফিজুর [সম্পাদিত] (১৯৮৯)। *একুশে ফেব্রুয়ারী*, প্রথম প্রকাশের অনুরূপ সংস্করণ। ঢাকা: পুথি পত্র প্রকাশনী।

সুলতান, মোহাম্মদ (১৯৮৩)। 'অন্তরঙ্গ কথামালা', *হাসান হাফিজুর রহমান*। খালেদ খালেদুর রহমান [সম্পা.]। ঢাকা।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল (১৯৯৮)। *একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলন*। ঢাকা: জাগৃতী প্রকাশনী।

হক, গাজীউল (১৯৮০)। *স্মৃতিচারণ'৮০*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০২২)। 'পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিক: নবতর চেতনায় উজ্জ্বল'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*। হারুন রশীদ [সম্পা.]। সংখ্যা ১০২-১০৩। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্রিকা

দৈনিক *আজাদ*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ১৯৫৩।
সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩।